নেহরুর আমলে লোকসভায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় ছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৬৪টি আসন, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৩৭১টি আসন, আর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৩৬১টি আসন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৫ শতাংশ ভোট, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তা ছিল ৪৪.৭ শতাংশ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্টরা পেয়েছিল ৩.৩ শতাংশ ভোট, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৯.৯ শতাংশ। সমাজতন্ত্রী দলের আসন ও ভোট দুইই কমেছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তারা মাত্র ৬টি আসল দখল করেছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় জনসংঘের আসন সংখ্যা বেড়েছিল, প্রাপ্ত ভোটের হারও বেড়েছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে লোকসভায় জনসংঘের আসন সংখ্যা হল ১৪। দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তারা ১৮টি আসন অধিকার করেছিল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট দল কেরল রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছিল। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল ভোটারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছিল, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভোটারের সংখ্যা ছিল একুশ কোটির বেশি। এদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হল ভারত, এখানে গণতন্ত্র সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল। নেহরুর আমলে যে তিনটি সাধারণ নির্বাচন হয় তা ছিল মোটামুটি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। পল ব্রাস মন্তব্য করেছেন যে নেহরুর পর নির্বাচন ব্যবস্থায় কিছু বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল, হিংসা ও বুথ দখলের ঘটনা ঘটেছিল। নেহরু সংসদীয় গণতন্ত্রকে সযত্নে লালন করেছিলেন, সাংবিধানিক কাঠামো মেনে নিয়ে কমিউনিস্ট ও দক্ষিণপন্থী দলগুলি নির্বাচনে অংশ নিত। এতে গণতন্ত্রের ভিত অবশ্যই শক্তিশালী হয়েছিল। বিশ্বের দৃষ্টি পড়েছিল ভারতের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর। অস্বীকার করা যায় না ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে গণতন্ত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

২২.৩ ভারতের বিদেশনীতির ভিত্তি

১৯৪৭-১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত যে বিদেশনীতি অনুসরণ করেছিল তাকে বলা হয় নেহরুর বিদেশনীতি যদিও নেহরু নিজেই বলেছেন যে নেহরুর বিদেশনীতি বলে কিছু নেই, এ হল ভারতের বিদেশনীতি। দুটি উপাদানের ওপর নির্ভর করে একটি দেশের বিদেশনীতি গড়ে ওঠে—অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বৈদেশিক পরিস্থিতি। বিদেশনীতির লক্ষ্য হল একটি দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা। অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে বিদেশনীতির অনেকগুলি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পশ্চিম এশিয়া, ইউরেশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত

ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তিন সাগর ভারতের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে দিয়েছে, সামুদ্রিক শক্তির ওপর ভারতকে গুরুত্ব আরোপ করতে হয়েছে। আয়তনে ভারত হল পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র (মোট আয়তন ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কিমি)। ভারতের সীমান্তে রয়েছে চিন, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও বাংলাদেশ। চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধ রয়েছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রয়েছে, নাগাল্যান্ড, অসম, মণিপুর ও ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। ভারতের আছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, উর্বর শস্যক্ষেত্র, অরণ্য, নদী ও খনি। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্য দেশের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে। ভারতের দুর্বলতা হল এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার সাত বা আট শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ৪০ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। ধনের অসম বণ্টন হল এই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, ভারতবাসীর গড় মাথাপিছু আয় হল ৪৬০ ডলার। অর্থনৈতিক উন্নতির হার বাড়ানোর জন্য সরকার এমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না যার জন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়।

বিদেশনীতির একটি সামাজিক পটভূমি থাকে। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর ঐক্য বা অনৈক্য বিদেশনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভারত হল একটি বহুজাতিক, বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ। সরকারকে বিদেশনীতি রচনার সময় দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা মনে রাখতে হয়। ভারতের সংস্কৃতিতে রয়েছে মানবতাবাদ, অহিংসা, পরমতসহিষ্ণুতা, অন্যায়ের বিরোধিতা প্রভৃতি। পৃথিবীর সর্বত্র মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলনকে ভারত সমর্থন করেছে, স্বাধীনতার পর ভারত এসব দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ভারত সর্বদা উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করেছে। এশিয়ার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সঙ্গে ভারত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। ঠান্ডা লড়াই শুরু হলে পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী। এই দ্বিধা বিভক্ত পৃথিবীতে নেহরু জোটনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রয়েছে মৌলবাদী প্রবণতা, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয়ের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভারতকে এজন্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসরণ করতে হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সংগঠনের যেসব দায়দায়িত্ব দেশের ওপর বর্তায় সেগুলি ভারতকে পালন করতে হয়। ভারতে যে দলই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুক না কেন বিদেশনীতিতে তাকে কতকগুলি সূত্র পালন করতে হয়। এগুলি হল জোট-নিরপেক্ষতা, উপনিবেশ বিরোধিতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ। দেশের স্বাধীন সংবাদমাধ্যম বিদেশনীতির ওপর নজর রাখে, কোনোরকম বিচ্যুতি দেখা দিলে সমালোচনা করতে ছাড়ে না।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বৈদেশিক পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেয়নি। কতকগুলি বৈদেশিক সমস্যা হল উদ্বাস্তু নিয়ে সংকট, ঠান্ডা লড়াই, গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন, পরমাণু অস্ত্র, সন্ত্রাসবাদ ও বিশ্বায়ন। স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে শরণার্থী নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকখানি জটিল হয়ে উঠেছিল, প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল। চিন পৃথিবীর বৃহত্তম জনাকীর্ণ দেশ, এই দেশ সাম্যবাদকে আশ্রয় করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ভারত প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল। বিরোধের সূচনা হল তিব্বত নিয়ে। সীমান্ত সংঘর্ষে পরাস্ত হলেও ভারত তার জোটনিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। বিশ্ব রাজনীতিতে সহযোগিতা ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা করা হল ভারতের কূটনীতির লক্ষ্য। বহুত্ববাদ হল ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনের অঙ্গ। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি মূলনীতি প্রণয়ন করেছিল যা 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। এই পাঁচটি শীল বা আচরণ হল প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা, অনাগ্রাসন, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক সমতা ও সুবিধার নীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

জওহরলাল নেহরু জোটনিরপেক্ষতা নীতির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ 'ফ্যাসিজম, উপনিবেশবাদ, জাতিবৈষম্য প্রভৃতি অশুভ শক্তির আমরা বিরোধী, পরমাণু বোমা, আগ্রাসন আর দমনপীড়নের আমরা বিরোধী। আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে এগুলির বিরুদ্ধে দায়বদ্ধ'। ভারত স্বাধীনতার আগেই ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করেছিল, স্বাধীনতার পরেও এই অবস্থান থেকে সে সরে দাঁড়ায়নি। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন ও বর্তমান উপনিবেশিগুলিকে মদত দেওয়া ছিল ভারতের নীতি। ভারতের বিদেশনীতির অন্য লক্ষ্য ছিল বিশ্বশান্তিকে মদত দেওয়া। হিরোশিমার পর পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। গান্ধিজির প্রেরণা, আইনস্টাইন ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো মনীষীদের উৎসাহ নিয়ে নেহরু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন। ভারতের নীতি ছিল পরমাণু অস্ত্র ধ্বংসের পক্ষে, সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে। নেহরু জোর দিয়ে বলতেন ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সহাবস্থান হল বিশ্বের টিকে থাকার একমাত্র পথ, অন্যথায় বিপর্যয় অনিবার্য। নেহরু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে তাঁর বিশ্বশান্তি ও সহাবস্থানের নীতিগুলি প্রচার করতেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নেহরু এশিয়ার দেশগুলি নিয়ে এশীয় সম্পর্ক অধিবেশন ডেকেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ আক্রমণ শুরু হলে তিনি আবার অধিবেশন ডেকে ডাচ অভিযানের বিরোধিতা করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলম্বোতে উপনিবেশ বিরোধিতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৫৫

খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির অধিবেশন বসেছিল। বিশ্ব শান্তিরক্ষা এবং পরমাণু যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেডে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতারা মিলিত হয়ে জোটনিরপেক্ষতা, নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির পক্ষে আবেদন রাখেন।

ভারতের বিদেশনীতির একটি বড়ো কাজ ছিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে মদত দেওয়া। ভারত কখনও কোনো জোটে যোগ দেয়নি, এজন্য পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সকলের কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহ, প্রযুক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার ব্যাপারে কোনো বাধা ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি দেশের কাছ থেকে ভারত অস্ত্রশস্ত্র, প্রযুক্তি ও শিল্পের সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিল। ভারত কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনীতে ভারতীয় সৈনিকরা যোগ দিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রশংসা অর্জন করেছিল। বিশ্বশান্তি রক্ষায় ভারতের ভূমিকাকে বহু দেশ প্রশংসা করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোরিয়া দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—সমাজতন্ত্রী, উত্তর কোরিয়া এবং পুঁজিবাদী দক্ষিণ কোরিয়া। কোরিয়া কমিশনের সভাপতি হিসেবে ভারতীয় প্রতিনিধি কে. পি. এস. মেনন কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবেদনে কোনো ফল হয়নি। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করলে কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কোরিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ভারত এই যুদ্ধের বিরোধী ছিল, এই যুদ্ধে কোনো বিদেশি শক্তির জড়িয়ে পড়ার বিরোধিতা করেছিল ভারত। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর প্রধান জেনারেল ম্যাকআর্থার রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন ছাড়াই উত্তর কোরিয়ায় ঢুকে পড়লে চিন এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বশান্তি বিপন্ন হয়ে পড়লে নেহরু যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। রাষ্ট্রসংঘ যে নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করেছিল তার প্রধান ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি জেনারেল থিমাইয়া। তিনি বন্দি প্রত্যর্পণের জটিল দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতির কার্যকারিতা কোরিয়া যুদ্ধে প্রমাণিত হয়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন ভারত সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং পুঁজিবাদী শিবির উভয়ের বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়েছিল। কোরিয়া যুদ্ধের পরেও ভারত চিনকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ দিতে বলেছিল।

কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ভিয়েতনামে ভিয়েতমিন ও ফরাসি উপনিবেশবাদীদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। ফরাসিরা পরাস্ত হয়ে ভিয়েতনাম ছেড়ে গেলে ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় মার্কিনিরা ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে

পড়েছিল। এখানেও ঠান্ডা যুদ্ধ গরম যুদ্ধে পরিণত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নেহরু ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেন। জেনিভাতে ইন্দো-চিন সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মেলন বসেছিল কিন্তু সমাধান স্থায়ী হয়নি। কম্বোডিয়া ও লাওস ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, এরা নিরপেক্ষ ছিল। এক্ষেত্রেও ভারতের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না। চিনের অনুরোধে ভারতকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি করা হয়েছিল। চিন ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথাও ভাবেনি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এক্ষেত্রেও সফল হয়েছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিলে এক আন্তর্জাতিক সংকটের উদ্ভব হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চায়নি, সুয়েজ কোম্পানিতে এদের অনেক টাকা লগ্নি করা ছিল। ভারত সুয়েজ খালকে মিশরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করত। তাছাড়া জোটনিরপেক্ষ মিশরের সঙ্গে নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ভারত আপসে এই বিরোধ মেটানোর প্রয়াস চালিয়েছিল কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইজরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে সুয়েজ আক্রমণ করলে যুদ্ধ বেধে যায়। রাষ্ট্রসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া এই আগ্রাসনের নিন্দা করেছিল। নেহরু একে নগ্ন আগ্রাসন এবং ঔপনিবেশিক নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বলে নিন্দা করেন। রাষ্ট্র-সংঘের উদ্যোগে এখানে শান্তি ফিরে আসে এবং ভারতীয় সৈন্য শান্তিবাহিনী হিসেবে সুয়েজে কাজ করেছিল। সুয়েজ সমস্যা সমাধানে ভারতের উদ্যোগকে ব্রিটেনও প্রশংসা করেছিল।

হাঙ্গেরি সোভিয়েত জোট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করলে রাশিয়া সেখানে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ এই ঘটনার নিন্দা করেছিল। কিন্তু ভারত এর বিরোধিতা করেনি বলে সমালোচিত হয়। ভারত বলেছিল সোভিয়েত সৈন্য হাঙ্গেরি ছেড়ে নিশ্চয় চলে যাবে কিন্তু ঘটনাটিকে পশ্চিমি দেশগুলি যেভাবে দেখছে তা ঠিক নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দুটি প্রভাবাধীন অঞ্চল গঠিত হয়েছিল। হাঙ্গেরি ছিল সোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চলে। ভারত রাশিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দা করলে দুদেশের সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিত, তা স্বাভাবিক করে তোলা হত কঠিন ব্যাপার। নেহরু হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেননি, প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে দুবছর দূত পাঠাননি। সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের প্রতি বিরক্ত হয়েছিল, রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর প্রস্তাব উঠলে রাশিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। অল্পকাল পরে অবশ্য ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। ভারতবিরোধী কোনো প্রস্তাব উঠলে রাশিয়া তাতে ভিটো দিত। ভারতের অবস্থা মোটেই অনুকূল ছিল না, তা সত্ত্বেও ভারত কোনো জোটের দিকে ঝুঁকে পড়েনি। ভারত সদ্য স্বাধীন আফ্রিকার দেশ কঙ্গোর অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় যথেষ্ট সক্রিয়

ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কঙ্গো বেলজিয়ামের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তামার খনি সমৃদ্ধ কাতাঙ্গা প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কাতাঙ্গার নেতা শোম্বেকে মদত দিয়েছিল বেলজিয়াম। বেলজিয়ান নাগরিকদের রক্ষার অজুহাতে বেলজিয়ান সৈন্য কঙ্গোর রাজধানীতে পৌঁছোলে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা রাষ্ট্রসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েছিলেন। রাষ্ট্রসংঘ নিরপেক্ষ থাকার কথা বললেও বিদেশি শক্তিগুলি প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু, প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা ও সামরিক নেতা মোবতুকে খাড়া করে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছিল। এই গৃহযুদ্ধে নিহত হলেন কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা। নেহরু রাষ্ট্রসংঘকে আরও উদ্যোগী হয়ে গৃহযুদ্ধ থামাতে বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন করতে বলেন। নেহরু ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করতে রাজি হন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে নিরাপত্তা পরিষদ এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করলে কঙ্গোয় ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করেছিল, গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কাতাঙ্গার বিদ্রোহী সরকারের পতন ঘটে। ভারতের জোটনিরপেক্ষতার নীতি, উপনিবেশ বিরোধী নীতি, এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলির পাশে দাঁড়ানোর নীতি এবং রাষ্ট্রসংঘের মতো সংস্থাকে সাহায্য করার নীতি অসম্ভব সাফল্য অর্জন করেছিল। নেহরু মনে করতেন সদ্য স্বাধীন দেশগুলি জোটে ভিড়লে তাদের স্বাধীনতা হারাবে। বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করবে, এসব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। জোটনিরপেক্ষ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোলে এরা লাভবান হবে।

২২.৪ জোটনিরপেক্ষতা ও তৃতীয় বিশ্ব

বিশ শতকের দুদশকের মধ্যে দু-দুটি মহাযুদ্ধ ঘটে যায়, অনেক আশা নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করা হয়। কিন্তু জাতিপুঞ্জ বিশ্বে শান্তিরক্ষা করতে পারেনি। শান্তির স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষরা নানা পরিকল্পনার কথা ভেবেছিল। নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদের অবসান, শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা, বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা দান, জোটমুক্ত পৃথিবী গঠন ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ পরবর্তীকালের বিশিষ্ট নেতারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। জওহরলাল নেহরু মনে করেন দুই মেরুর বিশ্বে তৃতীয় দুনিয়ার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মহাশক্তিধর দেশগুলি দুর্বল ছোটো দেশগুলিকে জোটভুক্ত করে নিয়ে তাদের দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করবে। এসব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা রুদ্ধ হয়ে পড়বে। পৃথিবী সাম্যবাদী ও পুঁজিবাদী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।